The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXIX (Issue 2), 2023 (pp.101 - 108)
Published in December, 2025

"রবীন্দ্রনাথের গানে লালনের অধ্যাত্মবাদ দর্শনের প্রভাব"

জাসিয়া মুজিব পড়শী *

প্রতিপাদ্যসার: বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর ভিতর সর্বাধিক পরিমাণে প্রকাশ ঘটেছে বাঙালীর সৌন্দর্যবোধ ও মননশীলতার উপাদানসমূহ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন দেবতার অনুসন্ধানের খোঁজ এসেছিল লালনের গান থেকেই। লালনের গানের দ্যোতনা খুঁজে পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের গানে। বিশেষ করে লালনের মানবতাবাদী দর্শন, অসাম্প্রদায়িকতা, দেহতত্ত্ব, মানুষের ভেতরে ঈশ্বরের বাস এবং আত্মতৃপ্তির ধারণা এই বিষয়গুলো রবীন্দ্রনাথের গানেও দেখা যায়।লালনের মতো রবীন্দ্রনাথ ডুব দেন রূপসাগরে অরূপ রতনের আশায়। লালনের "খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়" এই গান থেকে রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতার আগমন ঘটে। এই প্রবন্ধের আলোচনার মূল বিষয় রবীন্দ্র মনন ও চেতনায় লালনের গভীর তাৎপর্যময় অধ্যাত্মপূর্ণ গানের বাণী ও সুর। এছাড়া বাউল জীবন দর্শনে প্রভাবিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের রবি বাউল হয়ে ওঠা প্রসঙ্গেও বর্ণনা করা হয়েছে।

ভূমিকা:

"আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তাই সকল খানে"
(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩১৭)

সংগীত জগতের বিচিত্র রসের ধারায় যিনি বাংলা সংগীত অঙ্গনকে করেছেন মাধুর্যিত ,যার পদচারণায় মুখরিত শিল্পের বিভিন্ন শাখা তিনি আর কেউ নন আমাদের বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর গানের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই ঈশ্বর প্রেমের এক মহাত্মমিলন। বাউল গানের চেতনা ও জগৎ রবীন্দ্র মানসে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। সেই বাউল গানের ভাব জগতের শিরোমণি হলেন ফকির লালন শাহ্। লালনের সংগীত সাধনা ও দর্শন লৌকিক জীবনের গন্ডি পেরিয়ে শিক্ষিত নগরবাসীকেও মুগ্ধ করেছে ও প্রেরণা জুগিয়েছে। বাউলের চেতনাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জগৎ ও জীবন ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। বাউল গানের কথা ও সুর রবীন্দ্রনাথের চিন্তার জগতে প্রভাব ফেলে। সেই বাউল গানের জীবন ভাবনার উপলব্ধির রস রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন লালন ফকিরের গান থেকে। লালন তাঁর দর্শনে নিজ আত্মা ও পরমাত্মার মিলনের যোগসূত্রের আবিষ্কার করে দুই আমি প্রসঙ্গ এনেছেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক গানে সেই অচিন রূপের দেখা পাওয়া যায়।

বাউলের সন্ধান:

বাউলগান গ্রামীণ বাঙালীর ভাব মানসের সংগীত। বাউল শব্দের সঙ্গে সবাই কমবেশি পরিচয় আছে। বাউল শব্দের জন্ম নিয়ে নানা রকম মত রয়েছে। কেও বলেন 'বাতুল' শব্দ থেকে বাউল শব্দের জন্ম। কেউ মনে করেন 'বারু' শব্দের সঙ্গে ল প্রত্যয় যোগ করে শব্দটির উৎপত্তি। বিভিন্ন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে ও অর্থে বাউল শব্দের ব্যাবহার করেছেন। বাউলের সময়কাল নিয়েও ভিন্ন মত রয়েছে। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মনে করেন
"আনুমানিক ১৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৬৭৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বাংলার বাউল ধর্ম এক পূর্ণ রূপ লইয়া আবির্ভূত হয়।"

* সহকারী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বজেন্দ্রনাথ শীলের মতে, "বাউলের জন্ম ১৪শ শতাব্দীর শেষ ভাগে কি ১৫শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাউল জন্ম গ্রহণ করিয়াছে সিদ্ধা ও মুসলমান ফকির হতে" (চৌধুরী ১৩-১৪)।

ধারণা করা হয় , বৌদ্ধ সহজিয়ারা তাদের সাধনার কথা গানের ভিতর দিয়ে অনুসারীদের জানাতেন। চলতি কথায় এইসব দোঁহা "চর্যাপদ" বা 'চর্যাগীতিকা' নামে পরিচিত। ভাব অস্পষ্ট, আলোআঁধারি ভাষায় কিছুটা রহস্যময় ধাঁধার মতো এই গানগুলো।এই চর্যাগীতিকার ভেতরেই বাউল সাধনা ও গানের বীজ আছে লুকিয়ে। এই ভাবে বাউল তত্ত্বের আদি রূপ খোঁজ পাওয়া যায় বৌদ্ধ সহজ সাধনের ভেতর দিয়ে (চৌধুরী ১৫)।

বৌদ্ধ সহজিয়া মত, ইসলামি সুফিবাদ ও বৈষ্ণব সহজিয়া ধারার মিলনে গড়ে উঠেছে বাউল ধর্ম।সামাজিকভাবে পীড়িত ও ধর্মীয় অধিকার বঞ্চিত মানুষের জন্যে একটি শাস্ত্রাচারহীন উদার অসাম্প্রদায়িক লৌকিক ধর্মমতের সন্ধান জরুরী হয়ে পড়েছিল। জাত ধর্ম আর শাস্ত্রাচারের বালাই মুক্ত হয়ে সহজিয়া সাধনের প্রতি আকৃষ্ট এই মরমি মানুষগুলোই কালে কালে বাউল নামে পরিচিত হয়েছে।বাউলেরা বিষয় আসক্তি মুক্ত উদাসীন উপাসক সম্প্রদায়। গুরুই তাদের সাধনার মূল চালিকা শক্তি, আর এই সাধনা চলে দেহকে কেন্দ্র করে। তাদের কোন শাস্ত্র নেই ,গান আর গুরু মুখে মুখে যে উপদেশ দেন তাতেই তাদের সাধন-ভজনের নির্দেশনা থাকে। বাউল গানের আবার নানা পর্ব রয়েছে। কেউ একে দেহতত্ত্ব , মানুষতত্ত্ব , গুরুতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, আল্লাহ্ ও নবীতত্ত্ব, কৃষ্ণ ও গৌরতত্ত্ব এই ভাবে ভাগ করেছেন।

ফকির লালন শাহ্:

বাউল গানের জনপ্রিয়তা যার হাত ধরে এসেছে তিনি ফকির লালন শাহ্। মুক্তবুদ্ধি ,অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানব মহিমা বোধ তাঁর বাউল চরিত্রে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছিল। লালন সাঁই ১৭৭৪ সালে সেই সময়ের নদীয়া জেলার অধীন কুষ্টিয়ার ভাড়ারায় জন্মগ্রহণ করেন। লালন তাঁর যৌবনকালে ঘর ছেরেছিলেন। সমাজ সংসার বিচ্যুত লালন জগত ও জীবন জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজে পান সিরাজ সাঁই নামের তত্ত্বজ্ঞানী সিদ্ধ বাউল গুরুর সান্নিধ্যে এসে। এই সিরাজ সাঁইয়ের কাছেই তিনি বাউল মতবাদের দীক্ষা নেন। গুরুর নির্দেশে লালন কুষ্টিয়া শহরের কাছেই কালী নদীর কোল ঘেঁষা ছেঁউড়িয়া গ্রামে ১৮২৩ সাল নাগাদ আখড়া গড়ে তোলেন। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন জানিয়েছেন

"সিরাজ সাঁইয়ের নিকট উপর্যুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া লালন শাহ্ ফকির নাম গ্রহণ করিয়া কুষ্টিয়ার নিকটবর্তী ছেঁউড়িয়া গ্রামের ভিতর যে গভীর বন ছিল সেই বনের একটি আম্র বৃক্ষের নিম্নে বসিয়া সাধনায় নিযুক্ত হোন" (চৌধুরী ২৩-২৪)।

পরে স্থানীয় কারিকর বা তাঁতি সম্প্রদায়ের উদার সাহায্য ও সহায়তা তিনি লাভ করেন। এদের দান অনুদানেই গড়ে ওঠে ছেঁউড়িয়ার আখড়া। ছেঁউড়িয়া অঞ্চল কারিকর প্রধান। এই গ্রামের মানুষ বিশেষ করে কারিকর সম্প্রদায় লালন ফকিরকে খুবই ভক্তি শ্রদ্ধা করতো। প্রায় প্রতিটি কারিকর পরিবারেই লালনের শিষ্য ভক্ত ছিল। লালনের গান তাঁর সাধনার যে রীতি নীতি তারই ভাষ্য। তাই তাঁর সংগীত সাধনা ছিল একই সুতোয় গাঁথা। তাঁর গানে বাউল সাধনার বিভিন্ন প্রসঙ্গ ও পদ্ধতি চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। এছাড়া লালনের গানে সাধারণত দেহতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, ধর্মীয় গোঁড়ামি, অসাম্প্রদায়িকতা, প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় তাঁর গানে স্থান পেয়েছে। সাধনার অবলম্বন হয়েও লালনের প্রতিভার গুণে এগুলো সাহিত্যের স্বাদ এনে দিয়েছে। তাঁর সংগীত ছিলো অধ্যাত্ম - ভাবাবেগের ফসল। লালন মুখে মুখে গান রচনা করতেন আর তাঁর শিষ্যরা সেগুলো খাতায় লিখে রাখতেন। বেশির ভাগ সময়েই এই লেখার কাজটি করতেন ফকির মনিরুদ্দীন শাহ্।

ঠাকুর পরিবারে লালনের পরিচিতি

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাউল ও লালন দর্শনের প্রতি যে আগ্রহ তাঁর ভিত্তি গড়ে উঠেছে ঠাকুর পরিবারের সদস্যদের লালন সংগীত শোনার আগ্রহের মধ্য দিয়ে। ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথের আগে ও পরে লালন সংগীত ও বাউলের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলা দেবী, ইন্দিরা দেবী,সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাউল গানের সংগ্রাহক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন বলেছেন,

"মিসেস সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ার নিকট শুনিয়াছি যে তাহাদের শিলাইদহে অবস্থানকালে লালন প্রায়ই তাহাঁদের বোটে আসিতেন। লালনের সুদীর্ঘ বাবরী ছিল বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তাহাঁদের গান শুনাইতেন।"

মনসুরউদ্দীন এর এই কথা যাচাইয়ের জন্য রথীন্দ্র ঘটক চৌধুরী সত্যেন্দ্রনাথ জ্ঞানদা নন্দিনীর মেয়ে ইন্দিরা দেবীকে যে চিঠি লেখেন ১৯৫৭ সালের ২৬শে জুলাই তিনি তার জবাবে জানান "পূজনীয় জ্ঞানদা নন্দিনী দেবী কোথায় লিখেছেন বলে জানিনে, তবে লালন ফকির তাঁদের শিলাইদহে অবস্থান কালে প্রায়ই আসতেন এবং গান শোনাতেন" (চৌধুরী ২২-২৪)।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাউল প্রীতির প্রমাণ মেলে ১৮৮৯ এর ৫ মে শিলাইদহে পদ্মানদীর ওপারে বোটে বসিয়ে লালনের ছবি আঁকার ভেতর দিয়ে। সরলা দেবীর বাউল গানের প্রতি আগ্রহ ছিল।তিনি লালন সাঁই ও গগন হরকরার গান ও জীবনী সংগ্রহ করে 'ভারতী' (ভাদ্র ১৩০২) পত্রিকায় ছাপেন। এর তিন বছর পর ইন্দিরাদেবী পারমার্থিক গান নাম দিয়ে 'বীণা- বাদিনী' (৭ম ও ৮ম সংখ্যা, ২য় ভাগ ১৩০৫) পত্রিকায় লালনের গানের স্বরলিপি প্রকাশ করেন। এর আগে লালনের গানের কোন স্বরলিপি প্রকাশ পায় নি। এ থেকেই বুঝা যায় লালনের গান ও বাউল গানের প্রতি ঠাকুর পরিবারের সদস্যদের আগ্রহ ছিলো।

রবীন্দ্র মননে লালন

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ২২ বছর সে সময় তাঁর হাতে পড়ে বাউল গানের একটি চটি বই (সংগীত সগ্রহ ।বাউলের গাথা)। 'বাউলের গান' নাম দিয়ে তার একটি আলোচনা করেন ভারতী (বৈশাখ ১২৯০) পত্রিকায়।তখনো তিনি কোন বাউলের সাক্ষাৎ পান নি সম্ভবত। সুযোগ হয়নি মুখোমুখী বসে কোনো বাউলের গান শোনারও ।কিন্তু গানগুলো পড়ে তিনি যে স্বাদ পেয়েছেন তার ফলে তাঁর ভেতরে বাউল গানের প্রতি কিছুটা আবেগ ও একধরনের মুগ্ধতা জেগেছিল। আটাশ বছর বয়স পর্যন্ত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শহুরে 'খাঁচার পাখি'। এই বন্ধনমুক্ত হয়েছেন ১৮৯০ এর শেষ এবং ১৮৯১ এর শুরুর দিকে শিলাইদহ-শাহজাদপুর-পতিসরে জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়ে পাকাপাকিভাবে পূর্ববঙ্গের গ্রামদেশে- শিলাইদহে আসেন। এখানেই তিনি জমিদারির পাশাপাশি এক অভিনব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন। গ্রামীণ বাংলার জনপদ, প্রকৃতি, সাধারণ মানুষ এর সাথে দেখা ও সাক্ষাৎ এর সুযোগ মিলে। ফলে একদিকে জন্ম নেয় গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের জীবন ছেঁকে আনা গল্প-কাহিনী অপরদিকে খোঁজ মেলে 'অচিনপাখি' আর মনের মানুষের।জমিদারী পরিচালনার সুত্রেই রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন বাউল ফকির ও বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর সংস্পর্শে আসেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন:

"বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে" (উদ্দীন ৬৪-৬৫)।

রবীন্দ্রমানসে এই বাউল প্রভাবের মূলে ছিল লালনের গান। লালনের অধ্যাত্মবাদ রবীন্দ্রনাথের মনে প্রভাব ফেলেছিল। যদিও লালন সাঁইয়ের সাথে রবীন্দ্রনাথের সরাসরি দেখা হয়েছিল কিনা তা জানা যায় নি। কিন্তু শিলাইদহে গগন হরকরা, গোঁসাই গোপাল, সর্বক্ষেপী বোষ্টামী, ও লালনের শিষ্যদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ ও শিলাইদহের বাউল সম্প্রদায়ের সঙ্গে গভীর মেলামেশার অভিজ্ঞতা হয়েছে। চিঠিপত্রের মধ্যে একটি চিঠি পাওয়া গেছে যেটা তিনি শান্তিদেব ঘোষ এর বাবা কালী মোহন ঘোষ কে লিখেছিলেন:

"তুমিতো দেখেছো শিলাইদহেতে লালন ফকিরের শিষ্যগণের সহিত ঘন্টার পর ঘন্টা আমার কিরূপ আলাপ জমতো। তারা গরীব, পোশাক পরিচ্ছদ নাই। দেখলে বোঝার জো নাই তারা কত মহৎ। কিন্তু কত গভীর বিষয় কত সহজভাবে তারা বলতে পারে" (ঘোষ-১১৬)।

শিলাইদহে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ লালনের গান সংগ্রহে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। তিনি বলেছেন :

"বাউলের গান শিলাইদহে খাঁটি বাউলের মুখে শুনেছি ও তাদের পুরাতন খাতা দেখেছি"। কেউ কেউ বলেছেন তিনি ছেঁউড়িয়ার আখড়া থেকে লালনের গানের খাতা আনিয়ে ছিলেন যা রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত আছে। এই প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন "আশ্রমের কর্তৃপক্ষেরা বলে যে, সাঁইজীর আসল খাতা শিলাইদহের 'রবি বাবমুশাই লইয়া গিয়াছেন"। এ ধারণা থেকেই বলা হয় যে রবীন্দ্রনাথ ছেঁউড়িয়ার আখড়া থেকে লালনের মূল খাতাই সংগ্রহ করেছিলেন যা এখন শান্তি নিকেতনের' রবীন্দ্রভবনে' আছে। 'রবীন্দ্রভবনে' রক্ষিত লালনের গানের খাতায় রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি গানের শব্দ নিজ হাতে সংশোধন করেছেন। ১০৪, ১০৬ ও ১২১ সংখ্যক গান তিনটিতে পাঁচটি জায়গায় কয়েকটি শব্দ কবি স্বহস্তে কেটে তার মাথায় শুদ্ধ পাঠ লিখে রেখেছেন। ১৩২২ খ্রিস্টাব্দে আশ্বিন থেকে মাঘ সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'হারামণি' বিভাগে রবীন্দ্রনাথ নিজেই লালনের কুঁড়িটি গান প্রকাশ করে বিদ্বজ্জন সমাজে লালন শাহেক পরিচিত করান। সেইগান গুলো হলো:

১. আছে যার মনের মানুষ মনে - আশ্বিন
২. যে জন দেখছে অটল রূপের বিহার - ঐ
৩. কোথা আছে রে দীন- দরদী সাঁই -ঐ
৪. মন আমার আজ পড়লি ফেরে - ঐ
৫. আমার এ ঘর খানায় কে বিরাজ করে - ঐ
৬. আমার ঘরের চাবি পরেরই হাতে -ঐ
৭. চাঁদ আছে চাঁদে ঘেরা-অগ্রহায়ণ
৮. ক্ষ্যাপা তুই না জেনে তোর আপন খবর -ঐ
৯. আমার আপন খবর আপনার হয়না - ঐ
১০. এমন মানব জনম আর কি হবে -পৌষ
১১. মন আইনমাফিক নিরিখ দিতে ভাবো কি - ঐ
১২. সে লীলা বুঝবি ক্ষ্যাপা কেমন করে -ঐ
১৩. আমি একদিনও না দেখিলাম তারে-ঐ
১৪. হতে চাও হুজুরের দাসী - ঐ
১৫. বেদে কি তার মরম জানে -মাঘ
১৬. পাগল দেওয়ানের মন কি ধন দিয়ে পাই - ঐ
১৭. কোন সুখে সাঁই করেন খেলা এই ভবে -ঐ
১৮. দেখনারে ভাবনারে ভাবের কীর্তি-ঐ

১৯. খুজেঁ ধন পাই কি মতে-ঐ
২০. আয় দেখে যা নতুন ভাব এনেছে গোরা - ঐ

এই ২০টি গানের মধ্যে ১, ৩, ৭, ১০, ১১, ১৫, ১৬, ১৭ সংখ্যক ৮টি গান 'রবীন্দ্রভবনে' রক্ষিত খাতা থেকে গৃহীত। এ থেকে ধারণা পাই রবীন্দ্রনাথ অন্য সূত্র অর্থাৎ ভিন্ন খাতা, লালন শিষ্য কিংবা শিলাইদহের বাউলদের কাছ থেকেও লালনের গান সংগ্রহ করেছিলেন (চৌধুরী ৫৯-৬০)।

লালন গীতির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দুইটি বিষয় লক্ষ্যনীয়
১. লালনের গান সংগ্রহ, প্রকাশ ও আলোচনা
২. রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল রচনায় লালন সংগীত দর্শন থেকে প্রেরণা গ্রহণ।

১. লালনের গান সংগ্রহ, প্রকাশ ও আলোচনা :

এই মরমি সাধককে দেশে বিদেশে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম লালনের গানের উল্লেখ করেন ভাদ্র ১৩১৪ এর 'প্রবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত তাঁর 'গোরা' উপন্যাসে :

আলখাল্লা পরা একটি বাউল নিকটে দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া গাহিতে লাগিল

"খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়
তারে ধরতে পারলে মনো বেড়ি দিতাম পাখির পায়"।

এই একই গানের উল্লেখ মেলে জীবন স্মৃতি (১৩১৯) বইয়ের 'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ' অধ্যায়ে। সেখানে তিনি বলেছেন: "দেখিলাম বাউলের গানও ঠিক একই কথা বলিতেছে। মাঝে মাঝে বদ্ধ খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিন পাখি বন্ধন হীন অচেনার কথা বলিয়া যায়, মন তাহাকে চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায় কিন্তু পারেনা। এই অচিন পাখির নিঃশব্দ যাওয়া আসার খবর গানের সুর ছাড়া আর কে দিতে পারে!" (ঠাকুর ১১৫)

১৯২৫ সালে ভারতীয় দর্শন মহাসভার অধিবেশনে (The Philosophy of our people) শীর্ষক সভাপতির ভাষণে তিনি অচিন পাখির এই গানের উল্লেখ করেন। লালনের এই গানটির সঙ্গে তিনি ইংরেজ কবি শেলির কবিতার তুলনা করে শিরোপা দিয়েছিলেন এই মরমি কবি লালন ফকিরকে:

> "That this Unknown is the profoundest reality, though difficult of comprehension is equally admitted by the English poet as by the nameless village singer of Bengal, in whose music vibrate the wing-beats of the unknown bird, only shelley's utterance is for the cultural few, while the Baul song is for the tillers of the soil, for the simple folk of our village households, who are never board by its mystic transcendentalism."

এই 'অচিন পাখির' ভাব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা ও রচনা করেন। ' শেষসপ্তক'- এর তেরো সংখ্যক কবিতা এটি। রোম্যান্টিক অনুভুতির সঙ্গে মরমিচেতনার মিশেলে শিল্প-শরীর তৈরী। শুরুটা এই রকম :

"রাস্তায় চলতে চলতে
বাউল এসে থামল
তোমার সদর দরজায়।
গাইল, 'অচিনপাখি উড়ে আসে খাঁচায়।'
দেখে অবঝু মন বলে
অধরা কে ধরেছি"।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত ছাত্র সভার এক অধিবেশনে (১৩১৬) ভাষন দিতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে লালনের উল্লেখ করেছিলেন। এখানে তিনি লালন সম্পর্কে কিছু জানি বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন:

"লালন ফকির কুষ্টিয়ার নিকটে হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এরুপ শোনা যায় যে তাঁহার বাপ মা তীর্থযাত্রাকালে পথিমধ্যে তাঁহার বসন্তরোগ হওয়াতে তাহাকে রাস্তায় ফেলিয়া চলিয়া যান। সেই সময় একজন মুসলমান কবির দ্বারা তিনি পালিত ও দীক্ষিত হোন। এই লালন ফকির মুসলমান, হিন্দু, জৈন মত সকল একত্র করিয়া এমন একটি জিনিস তৈয়ার করিয়াছেন যাহাতে চিন্তা করিবার অনেক বিষয় হইয়াছে। এই বিষয়ে সকলেরই মন দেওয়া উচিত" (বঙ্গদর্শন, নবপর্যায়), (পৌষ ১২১৬)।

২. রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল রচনায় লালন সংগীত দর্শন থেকে প্রেরণা গ্রহণ

বাউলের কোন শাস্ত্র নেই, কোন বাঁধাধরা ধর্ম ও আচার নেই।গুরুর বাণী ও সাধকের গানই তার সাধনার সার। মহাজন- বাক্য সুরের আশ্রয়ে গান হয়ে দিশা দে তাকে গোপন আঁধার পথের সুলুকসন্ধান মেলে তারপর আলোকিত হয়ে উঠে তার মনের পৃথিবী।জীবন ও জগতের রহস্য ধীরে ধীরে ফুটে উঠে যখন সে দেহের ভাষা পড়তে পারে। বাউলের গান তাই একদিকে দেহজরিপের গান, স্বরূপ অন্বেষার গান, গভীর নির্জন পথে, মনের মানুষকে খুঁজে ফেরার গান অপরদিকে এই গান নিম্নবর্গের মানুষের দ্রোহের গান, প্রতিবাদের গান, শ্রেণিচেতনার গান, শুভ্র সুন্দর জীবন- স্বপ্নের গানও। বাউল তাই একই সঙ্গে মরমি ও দ্রোহী। রবীন্দ্রনাথ এই বাউলের গানের ভেতর দিয়েই তার মরমি ভূবনের সন্ধান করেছিলেন (চৌধুরী ৯৯-১০১)।

লালন ফকিরের মানবতাবাদী ও অসাম্প্রদায়িক দর্শন, বিশেষ করে তাঁর গান ও বাউল তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানে গভীর প্রভাব ফেলেছিলো। রবীন্দ্রনাথ লালনের গানের বাণী ও সুর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। লালনের গানের বাণী ও বাউল দর্শন যা ধর্ম ও জাতিভেদের ঊর্ধ্বে মানবতাবাদের কথা বলে তা রবীন্দ্রনাথের গানেও প্রতিফলিত হয়েছে। লালনের যে দর্শন গুলো রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিলো তা হলোঃ

মানবতাবাদী দর্শন : লালন মানবতাবাদী ছিলেন এবং মানুষের ভেতরের সত্ত্বাকে বড় করে দেখতেন এবং ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরোধিতার প্রকাশ ছিল তাঁর গানের বাণীতে। রবীন্দ্রনাথও এই মানবতাবাদী দর্শনে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

অসাম্প্রদায়িকতা : ফকির লালন শাহ্ ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ভেদাভেদ করতেন না। তাঁর গানে সকল ধর্মের মানুষের মধ্যেকার ঐক্য ও সমন্বয়ের রূপ ফুটে উঠে।রবীন্দ্রনাথও তাঁর গানে অসাম্প্রদায়িকতার সুর ফুটিয়ে তুলেছেন।

দেহতত্ত্ব : ফকির লালন সাঁই এর গানে দেহতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। মানবদেহের ভিতরেই ঈশ্বরের বসবাস। তিনি মানুষের ভেতরের ঈশ্বরকে অনুসন্ধানের কথা বলেছেন তাঁর গানে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানেও এই দেহতত্ত্বের প্রভাব দেখা যায়।

আত্ন-আবিষ্কার ও প্রশান্তি : লালন সাঁইয়ের গানে আত্ন-আবিষ্কার, আত্নার স্বাধীনতা, আত্নতৃপ্তি এবং প্রশান্তির উপর জোর দেয়া হয়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও তাঁর গানে আত্নোপলব্ধি ও শান্তির কথা বলেছেন।

সুর ও বানীর মাধুর্য : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরাসরি লালনের গানের সুর তাঁর গানে প্রয়োগ করেননি। কিন্তূ লালন ফকিরের গানের ভাব গাম্ভীর্য ও সুরের মাধুর্য কবিগুরুকে আকৃষ্ট করেছিল এবং সেই সুর ও বানীকে নতুনভাবে তিনি তাঁর গানে প্রয়োগ করেছেন।

বাউল লালন সারাজীবন নিজেকে জানার অন্বেষণে ঘুরেছেন বিভিন্ন জায়গায়। আর এই নিজেকে জানা নিজেকে চেনার মধ্য দিয়ে সেই মনের মানুষ, সোনার মানুষের খোঁজ পাওয়া যায়। 'আমি কি', 'আমি কে' এবং 'আমি কেন'

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়িয়েছেন আপন দেহ জরিপের মধ্য দিয়ে। আপন দেহ ঘরে যে পরম পুরুষের বাস, তাঁকে না চিনলে তো সাধন সিদ্ধি হয়না। লালন ফকির তাই বলেছেন :

"আমার এইঘর থানায় কে বিরাজ করে।
আমি জনম-ভর একদিন দেখলাম না রে"।

পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ বলেন :

"আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাইনি
তোমায় দেখতে আমি পাইনি"।

নিজে কে নিবিড় করে চেনা আর জানার ভেতর দিয়েই সেই 'অচিন মানুষের সন্ধান মেলে। এই নিজেকে চেনার ভেতরেই আছে সকল পরিচয়ের কথা। তাই লালন বলেন :

"যার আপন খবর আপনার হয়না
আপনারে আপনি চিনতে পারলে
যাবে সেই অচিনারে চিনা"।

রবীন্দ্রনাথ এই বাণীকেই বুকের মধ্যে ধারণ করে গেয়েছেন:

"আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না
এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা"।

লালনের অন্তিমকালে রচিত 'পার করো হে দয়াল চাঁদ আমারে ' এই গানটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ প্রান্তে রচিত গান 'সমুখে শান্তি পারাবার ভাসাও তরণী হে কর্ণধারে'র ভাবগত আত্মিক মিল লক্ষ করার মতো।

এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের আরো কিছু বাউল আঙ্গিকের গান আছে যাতে লালনের গানের ভাব ভাষা, ভাবনার আভাস পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ:

১. খ্যাপা তুই না জেনে তোর আপন খবর যাবি কোথায় (লালন)
   খ্যাপা তুই আছিস আপন খেয়াল ধরে (রবীন্দ্রনাথ)
২. আছে যার মনের মানুষ মনে, সে কি জপে মালা (লালন)
   সে যে মনের মানুষ, কেন তারে বসিয়ে রাখিস নয়ন দ্বারে? (রবীন্দ্রনাথ)
৩. আমার মনের মানুষেরি সনে মিলন হবে কত দিনে (লালন)
   আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে আমার মনে (রবীন্দ্রনাথ)
৪. আমারে কি রাখবেন গুরু চরণ দাসী / ইতরপানা কার্য আমার অহর্নিশি (লালন)
   আমি কেবল তোমার দাসী/ কেমন করে আনব মুখে তোমায় ভালোবাসি (রবীন্দ্রনাথ)
৫. কারে বলবো আমার মনের বেদনা/ এমন ব্যথায় ব্যথিত মেলে না (লালন)
   আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল, শুধাইল না কেহ (রবীন্দ্রনাথ)
৬. ঐ এক অজান মানুষ ফিরছে দেশে....(লালন)
   সে যে বাহির হল আমি জানি (রবীন্দ্রনাথ)
৭. কেন কাছের মানুষ ডাকছো শোর করে/আছিস তুই যেখানে সেও সেখানে খুঁজে বেড়াও কারো (লালন)
   আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে/তাই হেরি তায় সকলখানে (রবীন্দ্রনাথ)

এরকম আরো উদাহরণ পেশ করা যায় যেসব গানের বিশেষ বিশেষ শব্দ, রূপক, প্রতীক, উপমা, চিত্রকল্প, ভাব ও সুর কখনো আংশিক আবার কখনো বা পরোক্ষ উপায়ে লালনের গান থেকে নেওয়া। উপরের গান গুলো বিচার করলেই বোঝা যায় লালনের গান রবীন্দ্রনাথের মনে কিরূপ প্রভাব ফেলেছিল (চৌধুরী, ৬২-৬৫)।

"জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ
ধন্য হলো ধন্য হলো মানব জীবন"

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শক্তিমান, সচেতন, অসামান্য এক শিল্পী-পুরুষ। তিনি প্রাণের মানুষের অন্বেষণের মধ্য দিয়ে আত্মার স্বরূপকে খুঁজে পেয়ে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সকল ধর্মের ঊর্ধ্বে মানব ধর্মকেই খুঁজেছেন মানুষের মধ্যে। তাই তিনি লালনের বাণী ও সুরকে ভেঙে মনের মাধুরি দিয়ে নতুন ভাবে তৈরি করেছেন যা একান্তই 'রবীন্দ্রবাউল' এর রচনা। তাঁর মনের গভীরে ছিল বাউলের বাস, তাই তাঁর মরমি মানসে লালন হয়ে উঠেছিলেন প্রেরণার এক স্বতঃস্ফূর্ত উৎস।

তথ্যসূত্র

চৌধুরী, আবুল আহসান। *রবীন্দ্রনাথের লালন*। শোভা প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০১৩।

চৌধুরী, আবুল আহসান। *লালন সাঁইঃ মরমি ও দ্রোহী*। বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারী ২০১৭।

চৌধুরী, রথীন্দ্রকান্ত ঘটক। *কয়েকজন লোককবি এবং প্রসঙ্গত*। আষাঢ় ১৩৯১।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *জীবনস্মৃতি*। বিশ্বভারতী। জ্যৈষ্ঠ মাঘ। ১৯৬৮।

মনসুরউদ্দীন, মুহম্মদ। *হারামণি*, ১ম খণ্ড, বৈশাখ ১৩৩৭।

ঘোষ, শান্তিদেব। *রবীন্দ্রসংগীত বিচিত্রা*। জুলাই ১৯৭২।

সেনগুপ্ত, নন্দগোপাল। *কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ*। ওরিয়েন্ট সংস্করণ, ১৯৫৮।

সেন, সুকুমার। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ৩য় খন্ড। তৃ. স ১৩৬৮।